চুমু-কেবিন

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

।১।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল চুমু-কেবিনের থেকেই। শৈপত্রী আমায় বলেছিল, "প্লিজ, ডোন্ট ডু দ্যাট। তোমার মুখে পেঁয়াজের গন্ধ।"

"পেঁয়াজ?" আমি মুখের কাছে হাত নিয়ে গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

"নয়তো কি স্যান্ডাল উড?" শৈপত্রী কথাটা এমন করে বলেছিল যেন আমি কেমন মানুষ তা একমাত্র ওই গন্ধ বিচার করেই বোঝা সম্ভব।

শৈপত্রী যাতে না চটে তাই আমি জানলার পরদা সরানোর মতো করে হেসে বলেছিলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হয়তো। আসলে ফিস ফ্রাইয়ের সঙ্গে পেঁয়াজটা আমার খাওয়া উচিত হয়নি।"

শৈপত্রী খুব বিরক্ত মুখে উঠে গিয়ে চুমু-কেবিনের পরদা সরিয়ে দিয়েছিল।

আমার বোঝা উচিত ছিল যে মেঘ জমেছে বিস্তর, ঝড় আসছে। কিন্তু বুঝিনি! সাধে কি আর জেঠু বলত, "তুই হলি শিক্ষিত পাঁঠা, সিদ্ধ হতেও সময় নিবি।"

আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল যে শৈপত্রী অন্য দিকে গোঁত্তা খাচ্ছে। সল বা টান যে কোনও একটা উপায় না বাছলে এই ঘুড়িকে আমার লাটাইয়ে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

কিন্তু ছোট থেকেই সিদ্ধ হতে সময় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুড়িটাও ওড়াতে শিখিনি। বিশ্বকর্মা পুজোয় হাততালি দিয়ে কিছু না বুঝেই উত্তেজিত হয়ে ওঠাটাই শুধু প্র্যাকটিস করেছি। তাই ঘুড়ি যে কাটবে সেটা স্বাভাবিক নিয়মেই বুঝতে পারিনি।

বুঝলাম যখন ঘুড়িটা কাটল। মানে গত চারদিন আগে চুমু-কেবিনে বসার পর পরদা টানতে গিয়ে আমায় বাধা দিয়েছিল শৈপত্রী। ইংরেজি মিডিয়ামের উচ্চারণে বলেছিল, "এর দরকার নেই। ইউ আর নট গেটিং ইট এনি মোর। আই ওয়ান্ট টু কুইট। আয়াম ব্রেকিং অফ উইথ ইউ।"

যে কোনও গালাগালির মতো বিচ্ছেদের কথাও কি ইংরেজিতে বললে একটু কম ধারালো শোনায়? যে শোনে তার মন একটু কম খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, বলেছিলাম, "আজ তো পেঁয়াজ খাইনি!"

"গ্রো আপ হিরণ্য, আমরা আর একসঙ্গে থাকছি না। তুমি পেঁয়াজ খাও বা না খাও, উই আর নট ইন আ রিলেশনশিপ এনিমোর।"

"কেন?" আমার মনে হয়েছিল দশ লক্ষ কাচের জানলা ভেঙে পড়ল আমার বুকের ভিতরে, "কেন থাকছি না আমরা? কী হল হঠাৎ?"

"হঠাৎ নয়তো", শৈ ব্যাগ থেকে চুইংগাম বের করে এমন করে মুখে

দিয়েছিল যেন রাস্তায় জুতো সারাতে গেছে, "আমি হিন্ট দিচ্ছিলাম তোমায়। কিন্তু তুমি তো... মানে কী বলব। তাই বলছি গ্রো আপ।"

"কেন শৈ, কেন?" আমি ছোট্ট কেবিনটার ভিতরে জালে পড়া কই মাছের মতো লাফাচ্ছিলাম, "কেন এমন করছ?"

শৈ ক্যাজুয়ালি বলেছিল, "আমার বহুদিন ধরে মনে হচ্ছিল যে আমি ঠিক রিলেশনটা মানতে পারছি না। তারপর লাস্ট টু লাস্ট সানডে আমি স্পষ্ট করে বুঝলাম আমার কী চাই। হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্ট।"

"কী চাও তুমি? আমায় বলো। আমি সব এনে দেব। আমি কোথায় দোষ করলাম, বলো।" আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ভেঙে পড়া সেই সমস্ত কাচ ক্রমশ গেঁথে যাচ্ছে, কেটে বসছে আমার শরীরে।

শৈ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "ইটস নট ইউ, ইটস মি। যাই হোক, বেস্ট অব লাক ফর কামিং ডেজ। সরো, আমি যাব।"

এমন কিছু একটা ছিল শৈয়ের বলার ভঙ্গিতে যে আমি বুঝেছিলাম আমার প্রেমের মাথায় 'আরআইপি' পড়ে গেছে। আর কিছু করার নেই।

কেবিন থেকে বেরিয়ে শৈ যখন হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাইরে আমি শেষ চেষ্টা করেছিলাম, "কে শৈ? কার জন্য ছেড়ে গেলে তুমি আমায়?"

ট্রেনে করে বহু দূরে চলে যাওয়ার সময় মানুষ যেভাবে শেষবারের মতো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো অচেনা মানুষের দিকে তাকায়, সেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে শৈ বলেছিল, "আমার জন্য হিরণ্য, জাস্ট আমার নিজের জন্য।"

"কী হল? কার ধ্যান হচ্ছে?"

পিছন থেকে আসা গলার স্বরে চমকে উঠলাম আমি। দেখলাম রাজুদা, মানে আমার বস।

"কী রে, তুই আধঘণ্টা ধরে একই স্ক্রিন খুলে বসে কী করছিস? প্রেমে পড়লি না প্রেম থেকে উঠলি?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে ভাঙা দেওয়ালের মতো চোখে তাকিয়ে রইলাম রাজুদার দিকে।

রাজুদা বলল, "শোন, তুই তেলেই পড় বা জলেই পড়, কিছুদিন পড়ে আমাদের প্রেজেন্টেশন। আমার রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী তোকেই পিচ করতে হবে। তাই, পুল ইওর শকস ব্রাদার। না হলে কিন্তু কপালে খুব দুঃখ আছে তোর।"

ব্যর্থ প্রেমিকেরা তেল কাগজের মতো হয়। তাদের ওপর ডট পেনই বলো বা জেল পেনই বলো, কোনও কালির আঁচড়ই পড়ে না। রাজুদার কথাগুলো আমার মনেও কোনও দাগ কাটল না। মনে হল একটা মানুষ কেমন যেন যান্ত্রিক গলায় কী সব বলে গেল। ভাবলাম, কপালে দুঃখ? দেড় বছরের প্রেম যার এমন কারণ ছাড়া ভড়ুল হয়ে গেল তাকে বসের ভয় দেখানো! আরে, আমি কি থোড়াই কেয়ার করি ভিখারি রাঘবে?

আমার শুধু মনে হচ্ছে, কে ছেলেটা? কার জন্য আমাকে ছেড়ে গেল শৈ? সে কি আমার চেয়েও ভাল পড়াশুনোতে? আমার চেয়েও বেশি মাইনে পায়? আমার চেয়েও ভাল মানুষ? মনে হচ্ছে, আরেকটা ছেলের কাছে আমি হেরে গেলাম!

এই কথাটাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম নানুকে।

নানু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বলা যায় আমার একমাত্র বন্ধু। রিসেন্টলি একটা স্কুলে এসএসসি দিয়ে চান্স পেয়েছে। নানু ভাল ছেলে। সহজ কথায় আমায় বহু বার বহু কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে।

এবারও বলেছিল, "ভাল বলতে তুই কী বুঝিস? এটা কি স্কুলের অ্যানুয়াল ডে পেয়েছিস যে গুড কনডাক্টের জন্য তোকে প্রাইজ দেওয়া হবে! ভাল খারাপের ওপর প্রেম নির্ভর করে কোনওদিন?"

"তবে? তবে কেন?"

'নিহত গোলাপ বিচার পায় না কাকা, উত্তমকুমার বলে গেছেন। তাই মনটাকে সরিয়ে আন। প্রেম ভেঙে যাওয়ার পর সেলফ পিটি হল সবচেয়ে খারাপ। বারবার পায়খানায় দৌড়তে হয় কাঁদতে। কিন্তু পাবলিক তো গামবাট। ভাবে পেট খারাপ হয়েছে। তাই ভাল কথা বলছি পৃথিবী অন্যের প্রেম-ফ্রেম বোঝে না। তাই মন দিয়ে কাজ কর আর এসব ভুলে যা।"

ভুলে যাব? কী ভুলে যাব? শৈয়ের ওই হাসি? অমন চোখ? আমাদের ওই কেবিনের পরদা ঢাকা কিউবে জিভে জিভ

ডুবিয়ে চুমু—সব ভুলে যাব? আমি কি 'মেমেন্টো'র হিরো, না আমার হার্ড ড্রাইভ ক্র্যাশ করেছে? নানুর অমন হলে ও ভুলতে পারত? দিতে পারত ওই পেট খারাপের থিওরি!

সারাদিন আমার ভিতরের দম হারানো ঘোড়াটা বাড়িতে ফেরার পথে বড় রাস্তার মোড়ের ওই চুমু-কেবিনের সামনে এসে কেমন যেন মুখ থুবড়ে পড়ল।

আমাদের নর্থ কলকাতায় যে ক'টা কেবিন এখনও বেঁচে-বর্তে আছে তার ভিতরে এই কেবিনটাই বোধহয় সব চেয়ে বড়। দোতলায় উঠে দরজা দিয়ে ঢুকেই এক পাশে কালো কাঠের ফ্রেমের ওপর শ্বেত পাথরের টপ দেওয়া সার সার টেবিল। আর অন্য পাশে পর পর ছ'টা পরদা টানা কিউবিকল।

এই কেবিনগুলো সাধারণত প্রেমিক-প্রেমিকাদের দখলেই থাকে। আর ওই পরদার ওপারে মোগলাই, কাটলেট আর কফির সঙ্গে আরও কিছু খাবার-দাবারও চলে। আর সেই সব উত্তর আধুনিক খাবার-দাবারের জন্যই এই 'হিমাংশু কেবিন'-এর নাম হয়েছে চুমু-কেবিন।

আমি সেই চুমু-কেবিনের সামনে এসে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলাম আমার ভিতরের দম হারানো ঘোড়াটা কেমন যেন লুটিয়ে পড়ল ফুটপাতে। আর আমি হয়তো সেই ঘোড়ার শোকেই বাচ্চার মতো ফোঁপাতে লাগলাম। দেখলাম আমার সামনের চুমু-কেবিনে উঠে যাওয়ার সিঁড়িটা কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা আর ঝাপসা হয়ে এল।

আমি ভুলে গেলাম এটা রাস্তা। ভুলে গেলাম আমার বয়স ছাব্বিশ। ভুলে গেলাম এভাবে কাঁদলে কিচ্ছু ফিরে আসবে না। আসে না। আমি ঝাপসা চোখে তাকিয়েই থাকলাম ওই সিঁড়িটার দিকে।

"কিরে তুই?" ঝাপসা দৃশ্যের সামনে কে যেন এগিয়ে এল আমার দিকে।

ঘোড়ার শোকে নেতিয়ে পড়া আমি চোখ মুছতেও ভুলে গেলাম যেন। আমার মাথাও কাজ করছে না ঠিকমতো। কে এগিয়ে এল আমার দিকে? কে প্রশ্ন করল আমায়?

একটি মেয়েলি গলা আগের চেয়ে আরও চার ঘর গলার জোর বাড়িয়ে খিকখিক করে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল, "একী রে ধুতি, তুই কাঁদছিস! কেন?"

।২।

আমার নাম হিরণ্যদ্যুতি রয়। ধুতি নয় মোটেই। আসলে ওটা ঝিকির দেওয়া নাম। আমায় দেখলেই ও 'ধুতি' বলে ডাকে। এত বিরক্ত লাগে আমার যে কী বলব। বহুবার বলেছি যে সবাই আমায় হিরণ্য বলে, ও-ও যেন সেটাই বলে ডাকে, কিন্তু মেয়েটা কি শোনার পাত্রী? বরং সব শুনে উলটে বলে, "ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ঠিক একদিন না একদিন তোকে হিরণ্য বলেই ডাকব, বুঝলি ধুতি!"

ঝিকিরা আমাদের পাড়ায় এসেছে মাস ছয়েক। এখন কলকাতা জুড়ে যে পুরনো বড় বাড়িগুলো ভেঙে নতুন নতুন চক-কড়ির মতো ফ্ল্যাট বানাবার অভিযান চলছে তারই একটার ফল হল ঝিকিদের ফ্ল্যাট। এখানে বাবা আর মায়ের সঙ্গে ঝিকি আর ওর দাদা তুহিন থাকে।

মাস ছয়েকের ভিতরেই ঝিকি পাড়ার সবার সঙ্গে বেশ ভালই ভাব করে নিয়েছে। আসলে মেয়েটা বেশ মিশুকে আর গল্পবাজ। কিন্তু ওর ওই দাদাটা একদম উলটো। এমন মুখ করে পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় যেন লিলিপুটদের দেশে ভুল করে এসে পড়েছেন গালিভার।

ঝিকির মুখে শুনেছি ওর দাদা বেশ বড় চাকরি করে আর সুযোগ পেলেই জিমে গিয়ে কারি-কারি প্রোটিন শেক খায় আর লোহা লোফালুফি করে ষষ্ঠীচরণকে লজ্জা দেয়। এটা শোনার পর বুঝতে পেরেছি আমাদের এই ছোট বুক আর বড় পেটের দেশে ও অমন ছেনি হাতুড়ি দিয়ে তৈরি করা শরীর নিয়ে কী করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ঝিকির মুখে শুনেছি তুহিন নাকি মিস্টার ইন্ডিয়া কনটেস্টও নাম দেবে!

"তোমায় একবার বস ডাকছে।" বরখা আমার পাশে এসে আস্তে করে বলল।

"আমায়?" আমি দিবা দুঃস্বপ্নের থেকে ছিটকে এসে পড়লাম অফিসে।

বরখা ওর আই লাইনার সাজানো চোখ দু'টো বড় বড় করে বলল, "তোমার নামই তো হিরণ্যদ্যুতি, তাই না?"

আমি চেয়ারটা পিছনে ঠেলে উঠলাম। গা পিত্তি জ্বলে যায় কথা শুনলে। এই মেয়েটা আমার সঙ্গে কক্ষনও সোজাভাবে কথা বলতে পারে না। সব সময় চিমটি কেটে কথা বলে!

অবশ্য এটা তো হতে বাধ্য। এই অফিসে আমার একমাত্র কম্পিটিটর তো এই বরখাই। আমার যেটা পিচ করার কথা, সেটা যাতে ও করতে পারে তার জন্য নাকি প্রচুর চ্যানেল করেছিল। কিন্তু রাজুদা আমার নামটাই রেকমেন্ড করেছে। আর তারপর থেকে খোঁচার ইনটেনসিটি যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বরখা। বরখা মানে তো বৃষ্টি। কিন্তু এই বৃষ্টি কাব্য ভাব আনে না মোটেই। এ আসলে অ্যাসিড রেন!

রাজুদার চেম্বারটা আমার ঘরের থেকে কিছুটা দূরে। চেম্বারের পাশেই রাজুদার সেক্রেটারি লিসির টেবিল। ও সব সময় এমন করে রং-চং মেখে থাকে যে মনে হয় রঙের দোকানের শেড কার্ড। তবে মেয়েটা ভাল। খুব ফ্রেন্ডলি।

আজ আমায় দেখেই বলল, "হাই হিরণ্য, হোয়াটস আপ বাডি? লুকিং টায়ার্ড।"

আমি হাসার চেষ্টা করে অনিচ্ছুক দাঁতগুলো বের করলাম। টায়ার্ড তো হবই। রাতে কি আমার ঘুম হয়? চোখ বুঝলেই তো খালি শৈয়ের মুখটা ভেসে ওঠে সামনে। ভেসে ওঠে ওর হাসি, গালের টোল আর অদ্ভুত বাদামি চুলগুলো। এসব মনখারাপ করা ছবি চোখের সামনে ঘুরঘুর করলে কি আর ঘুম আসে!

লিসি বলল, "হি ওয়াজ লুকিং ফর ইউ। বস তোমায় লাস্ট টেন মিনিটস ধরে খুঁজছে। কিন্তু তাও তোমায় একটু ওয়েট করতে হবে বাইরে। এই মাত্র মুম্বাই থেকে সিএমডি কল করেছেন। টেলিকন চলছে। তুমি প্লিজ এই সোফাটায় একটু ওয়েট করো। বসের কথা শেষ হলেই আমি তোমায় বলব।"

লিসির টেবিলের থেকে দু'হাত দূরে ঝুটো লেদারের সোফা। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওটায় গিয়ে বসলাম। রাজুদা কেন খুঁজছে আমায়?

'কেন' শব্দটাকে আমি চিরকাল খুব ভয় করি। আর এটাই বারে-বারে আমার সামনে ঘুরে-ফিরে এসে ফণা তুলে নাচে। এই সেদিন যেমন ওই চুমু-কেবিনের সামনে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝিকি জিজ্ঞেস করেছিল, "একি রে ধুতি, তুই কাঁদছিস! কেন?"

"কই?" আমি কোনওমতে চোখ মুছে বলেছিলাম, "না না, মানে... চোখে... ওই..."

ঝিকি আমার হাত ধরে টানতে-টানতে উলটো ফুটের গড়াইদার চায়ের দোকানের বেঞ্চে নিয়ে বসিয়েছিল। বলেছিল, "আবার ঢপ! আমি স্পষ্ট দেখলাম। কেসটা কী বলতো?"

প্রেমের ধর্ম হল প্রকাশ। কিন্তু ব্যর্থ প্রেমের ধর্ম হচ্ছে ওমপ্রকাশ। মানে পুরনো দিনের সেই ক্যারাকটার অ্যাক্টরটি যে খুব ঘ্যানঘ্যান করত।

আমি তার মতো ঘ্যানঘ্যানে গলায় বললাম, "ওই শৈ, ও আমায় ছেড়ে দিয়েছে।"

ঝিকির মুখে শুনেছি ওর দাদা বেশ বড় চাকরি করে আর সুযোগ পেলেই জিমে গিয়ে কারি-কারি প্রোটিন শেক খায় আর লোহা লোফালুফি করে ষষ্ঠীচরণকে লজ্জা দেয়।

"ছেড়ে দিয়েছে মানে? বেঁধে রেখেছিল নাকি?" ঝিকি পকেট থেকে একটা গাম বের করে চিবোতে চিবোতে বলেছিল।

আমি বলেছিলাম, "আমাদের দেড় বছরের সম্পর্ক, আর বলে কি না ওর ভাল লাগছে না। এটা কি ইয়ার্কি পেয়েছে?"

ঝিকি নাক টেনে বলেছিল, "তোরা ছেলেরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল হোস কিন্তু। আরে বাবা, ওর তো ভাল না-ই লাগতে পারে। তুই অন্য কাউকে খুঁজে নে না। ল্যাঠা চুকে যায়।"

আমি ঝিকির দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারব না রে। তোর সঙ্গে তো ওর খুব ভাল বন্ধুত্ব। তুই ওকে একবার বল না প্লিজ।"

"আমি?" ঝিকির গায়ে যেন আরশোলা পড়েছে এমন করে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, "ও আমার কথা শুনবে কেন?"

"তাও, প্লিজ," দুর্ভিক্ষে ফ্যান চাওয়া মানুষের মতো আমি তাকিয়েছিলাম ঝিকির দিকে। বলেছিলাম, "আর দেখিস না যদি জানতে পারিস কোন ছেলের সঙ্গে এখন ও ঘুরছে।"

ঝিকি মাথা নেড়ে বলেছিল, "ইউ বয়েজ আর ইনকরিজবল। শেষ সব কিছুই হয়। সেটা মেনে নিতে শিখলি না!"

আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শক্ত গলায় বলেছিলাম, "আরে, কোথাকার কে একটা ছেলে এসে আমায় হারিয়ে দিয়ে যাবে, আমি তা কিছুতেই মানতে

পারব না।"

"হিরণ্য, বস ইজ কলিং ইউ ইনসাইড।" লিসির কথায় আমার আবার অফিসে অবতরণ হল।

আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেখা যাক রাজুদা কী বলে। আসলে আমার নিজেরও রাজুদার কাছে কিছু কথা বলার আছে।

রাজুদার মুখটা কেমন যেন ব্লটিং পেপারের মতো লাগছে আজ। কাঁচা-পাকা চুলগুলোও কেমন যেন উসখো-খুসকো।

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই রাজুদা চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "বোস। কী হয়েছে তোর হিরণ্য? এমন করছিস কেন?"

নাও, আবার 'কেন'!

আমি 'কেন'র তলায় চাপা না পড়ে সেটাকেই পালটা ছুঁড়ে দিলাম, "কেন রাজুদা?"

"কেন মানে? কী করছিস তুই? আচ্ছা, বল তো আমরা কী কাজ করি?"

এ আবার কেমন প্রশ্ন! আমি বুঝতে পারলাম না কথাটা কোন দিকে যাচ্ছে। বললাম, "আমরা তো ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট সেট আপ করি। মানে ফ্রম ডিজাইন টু এগজিকিউশন। কেন?"

"তুই একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। গোটা স্কাডা সিস্টেমটা ডিজাইন করা তোর কাজ। তোকে আমি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের কাজে বেলজিয়াম পাঠাবার জন্য মুম্বইতে রেকমেন্ড করছি, আর তুই সেখানে এমন ঝোলাচ্ছিস?"

আমি ঘাবড়ে গেলাম। শনির দশা চলছে নাকি আমার? অফিসে আবার কী করলাম আমি।

আমার মুখ দেখে রাজুদা মাথা নাড়ল, "দেখ তোর অবস্থা! আরে নিজেই বুঝতে পারছিস না কী কেলো করেছিস! আরে তামিলনাড়ুর ওই পেপার মিলটার লজিক ডিজাইনটা তোর করার কথা ছিল। সেটাতে কী করেছিস! মুম্বই থেকে আমায় ঝাড় দিল বস। এমন গবেটের মতো কাজ তুই করেছিস ভাবতে আমার অবাক লাগছে। আর এই সামনেই এক পার্টির কাছে আমাদের প্রজেক্ট ডিটেল প্রেজেন্ট করার কথা তোর। আমি নিজে তোর নাম রেকমেন্ড করেছি। আমার তো ভয় লাগছে এবার। সেখানে কী করবি তুই!"

আমি মাথা নিচু করলাম। আসলে শৈ না করে দেওয়ার পরের কয়েকদিন আমি খুব ভুলভাল ছিলাম, সেই সময়ই ওই কাজটা করা। জানি প্রফেশনালদের এমন অজুহাত দিতে নেই। কিন্তু ভিতরের সত্যিটাকে তো আর মারতে পারি না।

রাজুদা বলল, "শোন, অল ইজ নট লস্ট। আরও দু'দিন সময় আছে। মেন্ড ইট। আর এবার কোনও ভুল আমি চাই না। কেমন?"

আমি মাথা নাড়লাম। জানি এবার আমার চলে যাওয়া উচিত কিন্তু আমার যে একটা কথা বলার আছে। তাই দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কিছু বলবি?" রাজুদা জিজ্ঞেস করল।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "রাজুদা বাড়িতে একটা এমার্জেন্সি আছে। অফিস থেকে যদি লাখ দুয়েক টাকা লোন পাওয়া যেত... তবে..."

রাজুদা আমার দিকে এমন করে তাকাল যেন আমি ঘোড়ার ডিমের অমলেট খেতে চেয়েছি। বলল, "এই ব্লান্ডারের পর মুম্বই স্যাংশান করবে ভেবেছিস অত টাকা! আর আমি নিজেও রিস্ক নেব না তোর। এমনিতেই তোকে কেন আমি সুযোগ দিচ্ছি তাই নিয়ে কানাঘুঁষো হচ্ছে। আর রিস্ক নিই! শোন, আগে আমাদের প্রপোজাল সাকসেসফুলি পিচ কর পার্টির সামনে তারপর আমি পারসোনালি দেখব যাতে লোনটা হয়। আর সেখানে ঝোলালে... ইফ আই গো ডাউন, আই উইল টেক ইউ অ্যালং উইথ মি, বুঝেছিস!"

।৩।

আমাদের বাড়িটা খুব বড়। কিন্তু আমাদের ভাগে যে অংশটা পড়েছে সেটা খুব একটা কিছু বড় নয়। বরং ছোটই বলা যায়। দু'টো শোয়ার ঘর, একটা বসার প্লাস খাওয়ার জায়গা, একটা বাথরুম আর একফালি ছোট্ট একটা রান্না ঘর।

আমাদের মা ছেলের অবশ্য চলে যায় এতেই। আমার বাবা নেই। এক দিদি আছে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় ন'বছর। ফলে মোটামুটি একরকম ঝাড়া হাত পা বলাই যায়। মানে, বাইরের লোকে তেমনই বলে। কিন্তু আমরা জানি যে ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

বাবা সামান্য একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করত। খুব বেশি মাইনেও ছিল না। দিদির বিয়ে দিতে গিয়ে জমানো যা ছিল প্রায় সবই খরচ হয়ে গিয়েছিল। দিদির বিয়ের বছর চারেক পর বাবাও মারা যায় হঠাৎ। সে সময়টা আমাদের খুবই কষ্টে গেছে। জামাইবাবু না থাকলে আমাদের অবস্থা খারাপ হত আরও। কারণ জামাইবাবু মানে সত্যদা, আমাদের দায়ে দফায় সব রকমভাবে সাহায্য করেছে।

পড়াশুনো নিয়ে আমার কোনওদিনই সমস্যা হয়নি। ছোট থেকেই অঙ্কটা ভাল পারি। ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে যখন সবাই কোচিং-এ মেয়েদের প্রেমে পড়ছিল আমিও তখন প্রেমে পড়েছিলাম ক্যালকুলাসের। জয়েন্ট এ্যাক করতে আমার কষ্ট হয়নি একটুও। ইলেকট্রনিক্সটাও পেয়েছিলাম স্মুদলি।

সেখানেও রেজাল্ট ভাল ছিল। তাই ক্যাম্পাস থেকেই চাকরি পেয়ে যাই এই এমএনসি-তে। এই অবধি মন্দের ভাল হিসেবে চলছিল সব।

কিন্তু তারপরেই বিপর্যয় আসে। সত্যদার পার্টনারশিপের ব্যবসাটা হঠাৎ ধসে যায়। মানে, পার্টনার মাড়োয়ারি লোকটি প্রচুর টাকা উঠিয়ে ভেগে যায়। বাজারে ঋণ, অসমাপ্ত কাজ, ব্যাঙ্ক লোন সব নিয়ে সত্যদার খারাপ সময়ের সেই শুরু।

দিদিদের রং-চঙে জীবনটা কয়েক মাসের ভিতরে কেমন যেন চোকলা ওঠা খণ্ডহর ধরনের হয়ে পড়ে। জমানো সব টাকা পয়সা দিয়েও সত্যদার সব ঋণ শোধ হয় না। আমার ভাগনেটার স্কুল ফি দেওয়াটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। সেই সময় মা আমায় বলে ওদের পাশে দাঁড়াতে।

গতবছর দুয়েক আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করছি সত্যদাকে সাপোর্ট করার। সত্যদাও অনেকটাই মিটিয়ে এনেছে বাজারের দেনা। আর এখন শেষ মুহূর্তে এসে সত্যদার টাকার দরকার পড়েছে খুব। এক সঙ্গে দু'লাখ টাকা। এটা হলেই সত্যদা আবার নিজেকে সামলে নিতে পারবে। নতুন করে আবার শুরু করতে পারবে সব।

মা আমায় কয়েকদিন আগে বলেছিল টাকার কথা। অনেকের কাছে দু'লাখ টাকা এখনকার দিনে হয়তো অনেক টাকা নয়, কিন্তু আমার মতো ছেলের কাছে অবশ্যই অনেক টাকা। আমি এত টাকা কোথা থেকে দেব বুঝতে পারিনি। তখন মা-ই বলেছিল অফিস থেকে লোন করতে।

কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে লোন পাব না। মানে, রাজুদা ইচ্ছে করলেই হতে পারত, কিন্তু রাজুদাই যে বেঁকে বসেছে! আর সেটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। আমি কয়েকদিন যাবৎ যা ধ্যাড়াতে শুরু করেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমার সুযোগ কমে আসছে। রাজুদার ভরসা কমে আসছে আমার ওপর। ওই লোনটার জন্য আমায় আবার পুরনো ফর্মে ফিরতে হবে। কিন্তু সব বুঝতে পারলেও কাজে সেটাকে দেখাতে পারছি না কিছুতেই। চূড়ান্ত ক্যালাসের মতো আমি কাজে মন দিচ্ছি না। মানে পারছি না। প্রতি সাড়ে চার মিনিট অন্তর আমার মনে পড়ছে শৈপত্রীর কথা। আর আমার ভিতরে কে যেন ছোট ছোট ডোজে ভরে দিচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড। কে বলেছে আজে-বাজে খেলেই শুধু অ্যাসিডিটি হয়? প্রেম ভেঙে গেলেও মানুষের অ্যাসিডিটি হয়, আমি জানি।

অফিস থেকে আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু তা বলে সরাসরি বাড়িতে যাব না। আমার এখন মনখারাপ বলে নানু বলেছে ও আমায় নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাবে আজ। আমার এসব পোষায় না। গল্প, কবিতা, থিয়েটার, ছবি আঁকা, এসব ভাল লাগে না একদম। কী সব বলতে চায় মাথা মুণ্ডু বুঝিই না কিছু।

তবু, একা থাকলেই নাইট্রিক অ্যাসিডের ঢেকুড় উঠছে বলে নানুর ওই গ্রুপ থিয়েটার দেখার কথায় আমি আর না করিনি। কিছুর ভিতরে থাকলে আমার মনটা হয়তো একটু সারতে পারে।

হলেও অন্ধকারে বসে কালো-কালো মাথা দেখে আর মঞ্চের কঠিন-কঠিন কথাবার্তা শুনে আমার ডিপ্রেশন আরও বেড়ে গেল।

হল থেকে বেরিয়ে নানু কাঁধের ঝোলাটা ঠিক করে আমায় বলল, "সাব অলটার্ন কনটেক্সটে পোস্ট মডার্ন অ্যাপ্রোচটা দেখলি? দারুণ। তোর কী মনে হল বল।"

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, "এগুলো মানে কী?"

"সে কী! তুই এসবের মানে জানিস না?"

আমি বললাম, "তুই জানিস পিএলসি মানে কী? স্কাডা কাকে বলে?"

নানু থমকে গেল। চিরকাল বাংলার ছাত্র ও, এসব জানবে কেমন করে। বলল, "আহা রাগ করছিস কেন! সত্যি, শৈপত্রী চলে যাওয়ার পর থেকে তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস!"

আমি গোমড়া মুখে বললাম, "ও না চলে গেলে কি আমি সাব অলটার্ন আর পোস্ট মডার্ন ব্যাপার সব বুঝে যেতাম?"

নানু হাসল। মাথাটা ওর বরাবর ঠান্ডা। বলল, "তুই কি শৈয়ের সঙ্গে কথা বলেছিস?"

আমি রবীন্দ্রসদনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "ও নিজেই পোস্ট মডার্ন হয়ে গেছে। আমি তাই কানেক্ট করতে পারছি না।"

"আহা," নানু আমার কাঁধে হাত দিল, "বল না, রিসেন্টলি কথা বলেছিস?"

"না, ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, ওর মা সাবান শ্যাম্পুর সেলস ম্যান এসেছে, এমন মুখ করে বলল দেখা হবে না। ওর নাকি পরীক্ষা, তাই খুব ব্যস্ত। আর আমি যেন ওকে বিরক্ত না করি।"

"ব্যস? এতেই দমে গেলি?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "সারাদিন অফিস আমায় আঙ্কল টম করে রাখে। ফিরতে রাত হয়। কী করব বল? স্যাটারডে সানডেগুলো ওর বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করি। ওকে পাই না। মোবাইলে ফোন করলে কেটে দেয়। মেসেজ করে করে বুড়ো আঙুলটা চার মিলিমিটার ছোট হয়ে গেছে। ও একটারও রিপ্লাই করে না। আমি আর কী করতে পারি?"

নানু কিছু বলতে গিয়েও কেমন যেন থমকে গেল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই বললি শৈপত্রীর সামনে পরীক্ষা, না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ, ওর মা তো তাই বলল আমায়। কেন এমন জিজ্ঞেস করছিস?"

নানু আমার হাতটা টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর বলল, "ওই দেখ।"

আমি রবীন্দ্রসদনের ফুটপাতের থেকে রাস্তার দিকে তাকালাম। সন্ধের কলকাতায় এই জায়গাটা একদম জগা-খিচুড়ি হয়ে আছে। বাস, গাড়ি, লোকজন, ট্র্যাফিক পুলিশ সব নিয়ে খুব নাজেহাল অবস্থা। এর ভিতর আমায় কী দেখতে বলছে নানু?

আমি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম।

"ওরে কানা, ওই দেখ," নানু আমার ঘাড়টা ধরে হাত দিয়ে একটা দিকে নির্দেশ করল।

নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে যে এমন চারশো চল্লিশ ভোল্ট বিদ্যুৎ শরীরে পাক খেতে পারে তা আমি এই প্রথম বুঝলাম। দেখলাম রাস্তার অন্যদিক দিয়ে হাঁটছে শৈপত্রী। জিনস, টি-শার্ট পরা। বাঁ'কাঁধে আমারই দেওয়া ব্যাগ। শৈ হাঁটছে আর হাসছে। খুব হাসছে। আর সেই হাসিতে যোগ দিয়ে ওর ডানদিকে হাঁটছে ভবিষ্যতের মিস্টার ইন্ডিয়া, তুহিন।

সন্ধের ওই জট পাকানো কলকাতাটা যেন আমার মধ্যে ঢুকে এল একদম। তীব্র

দিদিদের রং-চঙে জীবনটা কয়েক মাসের ভিতরে কেমন যেন চোকলা ওঠা খণ্ডহর ধরনের হয়ে পড়ে। জমানো সব টাকা পয়সা দিয়েও সত্যদার সব ঋণ শোধ হয় না।

একটা যন্ত্রণা সেকেন্ডের মধ্যে ছড়িয়ে গেল শরীরে। আমি বুঝলাম, আসলে শৈকে আমি যতটা না ভালবাসি, তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি আমি ভালবাসি নিজেকে।

।৪।

পেশি না বুদ্ধি? সিম্পলিসিটি না সার্কাসের তাঁবুর মতো জামাকাপড়? ক্যারিশমা না ক্যালকুলাস? কোনটা পছন্দ করে মেয়েরা?

শৈ যখন নতুন-নতুন প্রেমে পড়েছিল আমার, বলেছিল, "তোমার সিম্পলিসিটিটাই তোমার চার্ম।"

বলেছিল, "ক্যালকুলাস ইজ সো সেক্সি! ইউ হ্যাভ গ্রেট ব্রেন মাসলস।"

বছর দেড়েকের ভিতরেই ক্যালকুলাস তার সেক্সিনেস হারাল আর আমি হারালাম সরল চার্ম! আমার এখন নিজেকে মনে হচ্ছে রাস্তার ধারে বিক্রি করা মরা সাহেবের জামার মতো। তুহিন! শেষ পর্যন্ত তুহিন! আমি ওই ছেলেটার কাছে হারলাম! ওই একটা রোড রোলারের কাছে হেরে গেল স্পোর্টস কার! শৈ, এই ছিল তোমার মনে!

লাঞ্চ আওয়ারে আমাদের অফিসের সামনের ফুটপাতে অনেক রকম খাওয়ার বসে। আসলে এই জায়গাটায় অনেক অফিস আছে, তাই লাঞ্চের সময় খাওয়ার দোকানগুলোর ভিড়টা ভালই হয়।

আমার মায়ের শরীর খারাপ। রান্নার লোকও নেই। মাকেই সব করতে হয়। তাই টিফিনের ঝোঝাটা মায়ের ওপর আর চাপাইনি। আমি নিজে রান্না-বান্নায় হিন্দি জানা শেক্সপিয়র। আসলে ওই যে বলেছি, আর্ট আমার আসে না। রান্নাও তাই আমার পেরিফেরির বাইরের জিনিস।

লাঞ্চে আমি বেশি খরচ করি না। সামান্য বাদাম মাখা বা মুড়ি বাদাম কিনে ফুটপাতের একধারে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিই। আগে ছ'টাকার কিনতাম। কিন্তু ইদানীং আমার প্রেম ভাঙার মোর্নিং ফেজ চলছে, তাই তিন টাকার বাদাম খাচ্ছি। আসলে মন খারাপ থাকলে আমার খিদে পায় না একদম।

"হাই!" লিসি এসে পাশে দাঁড়াল আমার।

লিসির মাখন-রঙা শরীরের সঙ্গে লাল ড্রেসটা এমন করে কামড়ে বসে আছে যে ওর পাশে ঝাঁকা নিয়ে বসা পেয়ারাওলার বিক্রি এক নিমেষে পাঁচগুণ বেড়ে গেল।

এই চত্বরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলছে। এতে কোথায় আমি উৎসাহিত হব, তা না আমি যেন নিভে গেলাম আরও। মনে হল শৈ-ও তো আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলত একসময়।

"হ্যালো, আই সেড হাই।" লিসি এবার এসে আমার কাঁধটা ধরল।

বাসের চাকার পাম্প ছাড়ার মতো একটা শব্দ হল চারধার থেকে।

আমি বললাম, "সরি, বলো।"

"কী হয়েছে তোমার? কিছুদিন ধরে দেখছি তুমি আউট অব সর্ট। এনিথিং সিরিয়াস?"

আমি লিসির দিকে এমন করে তাকালাম যে ওই তাকানোর ওপর ভর করেই ফিলোজফিতে আমায় পিএইচডি দিয়ে দিতে পারে যে কোনও ইউনিভার্সিটি। বললাম, "দেয়ার ইজ নাথিং টু বি সিরিয়াস অ্যাবাউট।"

লিসি হাসল, "ও, বুঝেছি। গোয়িং থ্রু আ ব্রেক আপ, রাইট?"

আমি অবাক হলাম। ছেলেরা মেয়েদের মনের কথা বুঝতে পারে না। কিন্তু মেয়েরা কী করে বুঝে নেয় ছেলেদের মনের কথা?

লিসি বলল, "আমারও হয়েছিল। আমি তো তিনমাস ভাল করে কথাই বলিনি কারও সঙ্গে। তারপর একদিন সকালে উঠে দেখলাম, আমার খিদে পাচ্ছে। সামান্য কথাতেই হাসি আসছে। আমার আবার সাজতে ইচ্ছে করছে। সুন্দর ছেলেদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে। আমি বুঝলাম আমার ওই ব্রেক আপের ফেজটা কেটে গেছে।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "যাঃ, এমন হয় নাকি?"

"অভিমানইয়ুকে মনে নেই?" লিসি ওর চেরি রঙের ঠোঁট বেঁকিয়ে পেয়ারাওলার আরও ছ'টা কাস্টমার বাড়িয়ে দিল।

"সে কে?" আমি চিনতে পারলাম না। আমাদের অফিসের কেউ কি? না মুম্বই হেড অফিসের কোনও এমপ্লয়ি?

"কাম অন সিলি," লিসি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

দুলিয়ে হাসল, "অর্জুনের ছেলে। মহাভারাতা। মনে নেই?"

"ও, অভিমন্যু! তার কী কেস? সেও কি আমার মতো প্রেমে কাঁচি খেয়েছিল নাকি? সেই ফাস্টেশানেই কি সুইসাইডাল হয়ে চক্রবূহ্যে সেঁদিয়েছিল?"

লিসি বলল, "না, তা নয়। ও যুদ্ধের ওই স্ট্র্যাটেজিক স্ট্রাকচারটাতে ঢুকতে জানত, বেরতে নয়। ফলে মারা গিয়েছিল অকালে। তেমনই প্রেমে পড়তে যেমন জানতে হয়, তেমন বেরতেও জানতে হয়। ফলিং ইন লাভ আর ফলিং আউট অব লাভ, দু'টোই খুব ইম্পরট্যান্ট। বুঝলে?"

দেখলাম শুধু আমি নয়, আশেপাশের সবাই, এমন কী পেয়ারাওলাটাও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে লিসির মহাভারত ব্যাখ্যা শুনছে। সুন্দরীরা যে বিষয়েই বলুক, পৃথিবীতে কোথাও তাদের শ্রোতার অভাব হয় না।

লিসি আবার বলল, "তোমাকেও বেরতে জানতে হবে। নয়তো মারা পড়বে। আর তোমার পারফরম্যান্স নিয়ে কিন্তু বস খুব ওয়ারিড। উনি তোমায় ব্যাক করছেন আর তুমি নিজে ব্যাক গিয়ারে যাচ্ছ! সামনে কিন্তু সিএমডি আসছেন হেড অফিস থেকে। তুমি নিজেকে গ্যাদার করো। তোমার ওই পেপার মিলের কাজটা তো এখনও শেষ হল না। আজ ডেডলাইন আছে বিকেল পাঁচটায়। মনে আছে তো?"

আমি মাথা নাড়লাম। কথাটা ঠিক বলেছে লিসি। আমি যেমন প্ল্যান করেছিলাম তাতে গতকালই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা আমার কাজটা। কিন্তু যতবারই মনসংযোগ করতে যাচ্ছি চোখের সামনে শৈ আর তুহিন ভেসে উঠছে আর সব অ্যালগরিদম গুলিয়ে আমার মাথা ঘুরতে শুরু করছে।

লিসি বলল, "রাতে মাঝে-মাঝে তোমার কথা ভেবে আমার কষ্ট হয় খুব। ইউ পুওর বেবি। প্লিজ মন দিয়ে কাজ করো, কেমন?"

লিসি চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ারাওলাকেও সবাই আগেকার দিনের প্লেগ আক্রান্ত রোগীর মতো ত্যাগ করল। আমি হাতের ঠোঙাটা ফেলে পেয়ারাওলার দিকে তাকালাম।

লোকটা রাগ-রাগ মুখ করে বলল, "আমার পেয়ারা শেষ, আপনাকে বিক্রি করব না।"

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। মহা মুশকিল, আমি পেয়ারা কিনতে চেয়েছি নাকি? তারপর বুঝলাম, ওর গোঁসা হয়েছে। লিসি কেন আমার কথা ভাববে রাত্রিবেলা!

আমি লোকটাকে বললাম, "ঠিক আছে ম্যাডামকে বলব রাতে তোমার কথাও ভাবতে, কেমন?"

অফিসের লিফটে রাজুদার সঙ্গে দেখা হল আমার। দেখলাম রাজুদার মুখটা গম্ভীর। আমায় দেখে সেটা যেন গম্ভীরতর হয়ে গেল। বলল, "পাঁচটায় কিন্তু ডেডলাইন। তোর হয়েছে?"

বললাম, "না, মানে লাঞ্চ করতে গিয়েছিলাম।"

রাজুদা বলল, "তা খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছিলি তো? হাত জড়ো করে 'থ্যাঙ্ক ইউ গড ফর ওয়ার্লড সো সুইট' গেয়েছিস? কোলে রুমাল পেতে খেয়েছিস!"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

রাজুদা লিফট থেকে বেরতে-বেরতে বলল, "তোর লজ্জা নেই? কাজ পড়ে আছে আর তুই টিফিন খাচ্ছিস? নাঃ, তোকে দিয়ে হবে না। ভাবছি বরখাকেই পিচ করতে পাঠাতে হবে। গিয়ে তোর ডেস্কে দেখ, একটা জিনিস পাঠিয়েছি।"

দুঃখের দিনে দু'পা রাস্তাকেও মনে হয় দু'হাজার মাইল। লিফট থেকে আমার নিজের সিটে আসার পথটাকে মনে হল সাতদিনের রাস্তা।

চেয়ার টেনে বসে দেখলাম মনিটারের পাশেই একটা বড় ফাইল রাখা আছে। ফাইলটা খুললাম। প্রজেক্ট সামারি। বুঝলাম রাজুদা নিজেই করে পাঠিয়েছে যাতে আমার ওটা নিয়ে সিএমডি স্যারের সামনে ডেমো দিতে কোনও অসুবিধে না হয়। আর বেশি সময় তো নেই, যদি ডিটেলে সব পড়তে না পারি তাই রাজুদাই সামারি করে আমায় রক্ষা কবচ পাঠিয়েছে।

আমার লজ্জা লাগল খুব। লোকটা আমার জন্য এত করছে আর আমি একটা অপদার্থের মতো প্রেম-প্রেম করে জাবর কাটছি! ঠিক করলাম আর না, এবার থেকে ফাটিয়ে কাজ করব।

সোজা হয়ে বসে আমি সিপিইউ-টা অন করলাম। তারপর দুরে বসা বরখার দিকে তাকালাম। ও আমায় দেখে হাসল। হাত তুলে নাড়ল একটু। যেন বলতে চাইল, 'বাই বাই'। আমি চোয়াল শক্ত করলাম। দাঁড়াও করাচ্ছি বাই। হিসেব করে দেখলাম এখন দু'টো বাজে। পাঁচটা মানে আরও তিনটে ঘণ্টা আছে হাতে। চেপে করলে কাজটা আড়াই ঘণ্টায় নামিয়ে দিতে পারব। আজ পর্যন্ত কোনও ডেডলাইন আমি ফেল করিনি। আজও করব না। প্রথম স্কোয়্যার থেকে বেরিয়ে আমায় একশোর খোপের দিকে ছুটতেই হবে এই সাপ লুডোর পৃথিবীতে।

দু'হাত ঘষে নিয়ে আমি সোজা হয়ে বসে মাউসটা ধরলাম। তারপর কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে চোখ দিলাম। ওঃ। সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকে এসে লাগল তির। হাত থেকে গাণ্ডিব নয়, মাউস খসে পড়ল। আমার কম্পিউটারের ডেস্কটপের ছবি প্রতি ছ'দিন অন্তর নিজের থেকেই পালটে যায়। এমন করেই আমি সেট করে রেখেছি। ফার্স্ট হাফে আমার খাতায় কলমে কাজ ছিল বলে মেশিন চালাইনি। এখন চালিয়ে দেখলাম, গতকালের সিনারি বদলে গেছে আজ। দেখলাম, মনিটারের বড় স্ক্রিন জুড়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে শৈপত্রী! এই ছবিটা এখনও রয়ে গেছে কম্পিউটারে!

একটা আস্ত রোড রোলার বসে গেল আমার বুকের ভিতরে। মনে হল অফিসের প্রতিটা আলো যেন নিভে আসছে একে-একে। পায়ের তলার মার্বেলের মেঝে চোরাবালির মতো টেনে নিচ্ছে আমায়। মনে হল, সব বৃথা। ফলই যখন পাওয়া যাবে না তখন কাজ করে আর কী হবে?

মাউস নয় এবার আমার হাতটাই যেন খসে পড়ল শরীর থেকে। দেখলাম দূরে বরখা হাসছে। হাত নাড়ছে। বলছে, 'বাই বাই'। বুঝলাম আমার মনের সমস্ত উদ্যম হত হয়েছে আবার। সাপের মুখে পড়ে আবার আমি ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান।

।৫।

বড় রাস্তায় বেরিয়ে বুঝলাম মনের ভিতর যে কালো রঙের জিনিসটা জমেছে তাকে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের ভাষায় বলে গ্লানি। বুঝলাম এটা জমলে মুখটা তেতো হয়ে যায়, সুবাতাসকে মনে হয় খাল পাড়ের হাওয়া আর প্রজাপতিকে লাগে চামচিকির মতো।

আজ রবিবার। আমার ছুটি। কলকাতাটাও অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশি ফাঁকা আর শান্ত। আমি জানি এই সময়টায় নানু চুমু-কেবিনের উলটোদিকের গড়াইদার চায়ের দোকানে থাকে। আমার তো নানু ছাড়া গতি নেই তাই শেখ বিকেলের রাস্তা পেরিয়ে আমি সেই দিকে হাঁটা দিলাম।

আজ দিদি এসেছিল সকালবেলায়। একাই এসেছিল। কথায়-কথায় একবার ওই টাকার কথাটাও তুলেছিল। দু'লাখ টাকা।

আমি যেন শুনতে পাইনি এমন করে টিভি চালিয়ে বসেছিলাম। মা যে আমার

দিকে তাকিয়েছে সেটা আমার মনের অ্যান্টেনা ঠিক টের পেয়েছিল। তবু আমি রি-অ্যাক্ট করিনি। মা দিদিকে ভরসা দিয়ে বলেছিল, টাকাটা ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে।

দিদি গেছে চারটের সময়। আর তার কিছু পরেই মা এসেছিল আমার ঘরে। আমি সকালের খবরের কাগজটা আবার উলটোচ্ছিলাম।

মা বলেছিল, "কিরে, দিদি সকালে যখন টাকার কথা বলল তখন তুই কিছু বললি না তো!"

আমি কোনও উত্তর না দিয়ে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলাম।

মা এক টানে কাগজটা সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, "কী হল তোর? পেপারে মুখ লুকিয়ে পার পাবি ভেবেছিস?"

আমি অসহায় চোখে তকিয়েছিলাম মায়ের দিকে, "চেষ্টা করছি মা, কিন্তু দু'লাখ যে অনেক টাকা!"

"তুই অফিসে বলিসনি?"

আমি বলেছিলাম, "হ্যাঁ বলেছি। কিন্তু আমার বস মানে... বলছে যে এখন..."

"ওই রাজু না কে তোকে তো খুব পছন্দ করে। তবে? হবে না কেন?"

আমি কী বলব মাকে? এইসব অফিসের ব্যাপার তো মা আর বুঝবে না। আমায় রাজুদা পছন্দ করে নিজের এক্তিয়ারের ভিতরের কাজ করতে দিতে পারে, তা বলে টাকার ব্যাপারে রিস্ক নেবে? আর আমার পারফরমেন্সও এখন ভাল নয়। কোন ভরসায় রাজুদা আমায় ব্যাক করবে?

তবে পারফরমেন্সের কথাটা তো আর মাকে বলা যায় না। সম্ভব নয়। কারণ সেসব শুনলে মা আর রক্ষা রাখবে না।

শৈপত্রীকে মায়ের প্রথম থেকেই অপছন্দ। আমিই জোর করে মায়ের মত করিয়েছিলাম। এখন যদি মা জানে যে ও আমায় ল্যাং মেরেছে তবে আর রক্ষে থাকবে না আমার। আর যদি এও জানে যে সেই শোকে আমি কাজকম্ম ডকে তুলে দুঃখ করতে বসেছি তবে তো আর কথাই নেই।

"কীরে?" মা খুঁচিয়েছিল আমায়, "কী বলছি তুই শুনতে পাচ্ছিস না?"

আমি বলেছিলাম, "কী করব মা, আমি চেষ্টা করছি তো।"

মা চিৎকার করে বলেছিল, "কিচ্ছু করছিস না তুই। অপরার্থ একটা অকৃতজ্ঞ। সত্য কত কী করেছে আমাদের জন্য! আর সেখানে ওর দুঃসময়ে তুই পেপার পড়ছিস? লজ্জা লাগে না?"

পেপার পড়তে আমার লজ্জা লাগে না। কিন্তু মা যেটা মানে করছে তার ফলে আমার মনে তখন থেকে একটা কালো রঙের জিনিস জমছে। আর তারপর থেকেই সুবাতাসকে মনে হচ্ছে খাল পাড়ের হাওয়া, তেতো লাগছে মুখটা। প্রজাপতি দেখে ভাবছি এই হেমন্তে শহরে এত চামচিকি এল কোথা থেকে!

নানুর পাশে আমি ঝিকিকে দেখে চমকে গেলাম একটু। এইরে সবার সামনে আবার আমায় ভুলভাল নামে ডাকবে।

আমায় দেখেই ঝিকি ঝিকিয়ে উঠল, "অ্যাই ধুতি, আয় এদিকে।"

আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল খুব। মনে হল আমায় ধুতি বলে ডাকবে বলেই অনাবশ্যক কথাটা বলল। মেয়েটার সবসময় এমন লোফার ছেলেদের মতো হাবভাব ভাল লাগে না আমার।

আমি গিয়ে নানুর পাশে বসলাম।

নানু হাতে চায়ের ভাঁড়টা সাবধানে দুই পায়ের মাঝে রেখে বলল, "কিরে মুখের অবস্থা এমন পাংচার কেন? কী হয়েছে?"

আমি কিছু বলার আগেই ঝিকি বলল, "কী আর হবে, শৈ যে ধুতি খুলে দিয়েছে ওর। এমন গাড্ডায় পড়া মানুষ আমি কোনওদিন দেখিনি।"

আমি ফোঁস করে উঠলাম, "তুই কথা বলবি না একদম। বললাম তোকে শৈয়ের সঙ্গে কথা বলতে। বলেছিস? সব জেনেও ন্যাকা সাজিস না তো।"

"দেখ, শৈ তোকে আর চায় না। সেটা স্পষ্ট। আমি ফালতু ওকে বুঝিয়ে কী করব? এটা ফ্রি কান্ট্রি। ওসব আমায় বলবি না। আর সব জেনেও মানে? কী জানি আমি?"

আমি উত্তেজিত গলায় বললাম, "আবার? তুই জানিস না তোর দাদা মানে ওই তুহিনের সঙ্গে শৈ ঘুরছে আজকাল!"

"দাদা?" ঝিকির চোখগুলো গোলগোল হয়ে গেল, "দাদার সঙ্গে?"

"না বিশ্বাস হলে নানুকে জিজ্ঞেস কর। ওই তো আমায় দেখিয়েছে।"

নানু চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে আমায় সমর্থন করল।

ঝিকি মাথা নিচু করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর ছেলেদের মতো করে কাটা চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "তাও যদি হয়, তাতে তোর কী? ওরা যদি নিজেদের পছন্দ করে তবে তোর এত জ্বলছে কেন?"

আমি বললাম, "ও, তুই ওটা সাপোর্ট করছিস?"

"আমি মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দকে সমর্থন করি। কেন করব না? তোকে ওর ভাল লেগেছিল বলে ওর মনে হয়েছিল। এখন দেখছে যে তোকে নয় ওর অন্য কাউকে ভাল লাগছে। হতেই পারে। মানুষ ভুল করেই। সেটা শুধরে নিলে সমস্যা কোথায়?"

আমি বেঞ্চ থেকে উঠে পড়লাম, "মানে? ভুল মানে? আমায় পছন্দ করা ভুল হয়েছিল? আর তুহিন ঠিক পছন্দ?"

ঝিকি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা

নাড়ল। তারপর নানুকে বলল, "আমি আসি। ওকে কিছু বলা বৃথা। ও পুরো গন কেস।"

গন কেস? আমি? আমার মাথার ভিতর একটা বিস্ফোরণ হল হঠাৎ। বাড়িতে দিদির অমন আর্থিক অবস্থা, মায়ের গঞ্জনা, অফিসে টেনশন আর এখন ঝিকির কথা! সবাই কি পেয়েছে আমায়? আর কতদিন এমন হয়ে থাকব? আর কতদিন? শৈকে ভালবেসে আমি কি পাপ করেছি নাকি যে সবার কথার তলায় থাকতে হবে? তা ছাড়া আমার জীবনটাও যে নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেখানে আমায় অফিসে গুবলেট আর বাড়িতে অশান্তি পোহাতে হচ্ছে সেখানে শৈ অন্যের সঙ্গে হাসি-হাসি মুখে ঘুরে বেড়াবে? একি কোনও উচিত কথা? দেশে আইনকানুন বলে কিছু নেই নাকি? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

আমি উঠে পড়লাম। আজ এর একটা বিহিত করতেই হবে।

নানু থতমত খেয়ে বলল, "কী হল? তুই আবার উঠলি কেন? কোথায় যাবি?"

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "হেস্তনেস্ত করতে। দেখি শৈয়ের মা আমায় আটকায় কী করে। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? আমি পেপার টাওয়েল নাকি যে ইচ্ছে হল ব্যবহার করল আর তারপর ফেলে দিল! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।"

নানুর অবাক মুখের ওপর দিয়ে আমি গটগট করে হাঁটা দিলাম। অনেক গুড বয় হয়ে থেকেছি, আর নয়। হিরণ্যদ্যুতি থেকে আমায় হিরণ্যকশিপু হতেই হবে, তাতে আমার যা ইমেজ হয় হবে। আই ডোন্ট কেয়ার কানাকড়ি!

।৬।

না, আমি স্যাডো করি না। তাই গোটা প্রেজেন্টেশনটায় বস মানে আমাদের সিএমডি স্যর আমার দিকে তাকিয়ে যখন মিটিমিটি হাসছিলেন আমার অবস্থা খারাপ হচ্ছিল বেশ। আমি কথা বলতে-বলতে আমার টাই ঠিক করছিলাম। হাত দিয়ে জামার বোতাম দেখছিলাম। এমনকী একবার টুক করে ঘুরে প্যান্টের চেনটাও দেখেছি। নাঃ, সবই তো ঠিক আছে, তবে এমন করে হাসছেন কেন স্যার?

প্রেজেন্টেশন শেষে স্যার একটা মক কোয়েশ্চন আনসার সেশন রেখেছিলেন। সেখানে স্যার, রাজুদা থেকে শুরু করে বরখার মতো জুনিয়াররাও আমায় নানা প্রশ্ন করেছে। গোটাটাই আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার পরীক্ষা হচ্ছে। একটা কাজে কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাব, তাই আমি কতটা যোগ্য বিচার করা হচ্ছে। তা যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছি আমি। যদিও বরখা খুব কঠিন আর জটিল প্রশ্ন করছিল তবু আমায় খুব একটা কাবু করতে পারেনি। আসলে গতকাল রাত জেগে আমি রাজুদার তৈরি করে দেওয়া ওই প্রোজেক্ট সামারিটা ভাল করে পড়েছিলাম।

প্রেজেন্টেশন শেষ করেই আমি ওয়াশরুমে এসে ঢুকেছি। আমার হাত পা কাঁপছিল গোটা সময়টা ধরে। কতটা ঠিক মতো পারব আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল।

এখন ঘাড়ে, মুখে জল দিয়ে কিছুটা ভাল লাগছে।

আমি নিজেকে ভাল করে দেখলাম আয়নায়। চোখের তলায় কালি পড়েছে। গালটাও বসে গেছে বেশ। রোগা হয়ে গেছি আমি। মুখের সেই স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যটাও আর নেই। কেমন যেন একটা কালো হয়ে যাওয়া রুপোর পাত্রের মতো লাগছে নিজেকে। এ আমার কী হল? একটা মেয়ে এসে এমন ভেঙে দিয়ে গেল আমাকে? একজনের হুইমজ আর ফ্যান্সির ওপর কি নির্ভর করে আরেকজনের জীবন? আচ্ছা, আমি কি অবসেসড? আমি ভাল করে চিন্তা করছি আজকাল। মনে হচ্ছে প্রেম হারানোর যন্ত্রণা তো আছেই, কিন্তু সারা জীবন ফার্স্ট হতে-হতে আমার খারাপ হয়ে যাওয়া অভ্যেসটা কিছুতেই মানতে পারছি না যে আরেকটা ফালতু ছেলের কাছে আমি এমন গো হারান হেরে গেলাম। একটা শরীর সর্বস্ব ছেলে আমায় হারিয়ে দিল! এই ভাবনাটাই যেন আমায় আরও কাহিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে সেদিনের পর থেকে এটা আমায় আরও কুরে-কুরে খাচ্ছে।

আমি কথা বলতে চাইনি ওর সঙ্গে। কে কথা বলবে একটা মাংসের পাহাড়ের সঙ্গে? দেখলেই আমার গা গুলোয়। কিন্তু তুহিনই আমার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল।

চায়ের দোকান থেকে আমি সেদিন রাগ করে শৈদের বাড়ির দিকে যাবারপথে তুহিনকে পেয়েছিলাম।

আমি কথা বলতে চাইনি ওর সঙ্গে। কে কথা বলবে একটা মাংসের পাহাড়ের সঙ্গে? দেখলেই আমার গা গুলোয়। কিন্তু তুহিনই আমার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। আমি পাশ কাটাতে গিয়েও পারিনি। আরে অমন এভারেস্টের মতো শরীরকে টপকাব কী করে! আমি তো আর এডমন্ড হিলারি নই!

"কোথায় যাচ্ছ?" তুহিন ওর ইংরেজি উচ্চারণে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল।

"শৈয়ের কাছে।" আমার মুখ দিয়ে ফট করে সত্যিটা বেরিয়ে গিয়েছিল। আসলে আমি বলতে চাইনি। কিন্তু মাথাটা এমন গরম হয়েছিল যে ইনস্ট্যান্ট মিথ্যে বানাতে পারিনিনি আর।

"কেন?" তুহিন ভুরু তুলেছিল।

"তোমায় বলব কেন? তুমি কে ওর? প্রাইভেট সেক্রেটারি?"

"চিল ম্যান," তুহিন হাত তুলে বলেছিল, "শৈ এখন কলকাতায় নেই। ও কলেজের এক্সকারশানে গেছে ফর সেভেন ডেজ়। তাই এমন ফালতু এনার্জি লস করো না।"

"শৈ কলকাতায় নেই?" আমি রাগতে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপরই অবশ্য মনে পড়ে গিয়েছিল যে আমি রেগে আছি খুব। বলেছিলাম, "তা তুমি জানলে কী করে?"

"আমার বন্ধু শৈ, তাই জানি।"

"বন্ধু?" আমি মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলাম, "বন্ধু না লাভার? লজ্জা করে না অন্যের প্রেমিকাকে ভাঙাতে?"

"মানে?" তুহিন ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

"মানে বোঝো না? খোকাবাবু নাকি তুমি? কাবাবে হাড্ডি হয়ে তো কাটিয়ে নিলে শৈকে! কী ভেবেছ, আমি কিছু বুঝতে পারব না? আমি বোকা?"

তুহিন কী বলবে যেন বুঝতে পারছিল না।

"আসুক শৈ আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। ওর ছেলে ঘোরানো বের করছি আমি। শি ইজ় আ বিচ, বাট আয়াম নট হার ডগ, আন্ডারস্ট্যান্ড।" তুহিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি গটগট করে হাঁটা দিয়েছিলাম।

ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আমি নিজেকে গোছালাম। এমন ভাঙাচোরা পুরনো রুপোর মতো চেহারা নিয়ে ঘোরাটা ঠিক হচ্ছে না। তা ছাড়া আমি ঠিক

করেছি নিজেই একবার সিএমডি-র সঙ্গে কথা বলব লোনের ব্যাপারে। আর সেটা বলতে গেলে আমায় কনফিডেন্ট আর ঠিকঠাক হয়ে যেতে হবে।

আমি পাশের কাচের প্যানেলে একবার চট করে দেখে নিলাম নিজেকে।

"আরে, হোয়াট আর ইউ ডুইং?" লিসি এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

"নাথিং মাচ, কেন?"

"স্যর ডাকছেন তোমায়।" লিসির স্বাভাবিক চপলতা দেখলাম চলে গেছে। আসলে সুপার বস এসেছেন তো তাই অফিসের সবাই একটু ভড়কে আছে আজ।

বললাম, "আমায়?"

'নয়তো কী, আমায়?" লিসি বেশ বিরক্ত হল, "নাও হেস্ট। বসকে কোনওদিন ওয়েট করাতে নেই।"

রাজুদার ঘরের সামনে সিএমডি দাঁড়িয়েছিলেন। রাজুদা লিসির টেবিল থেকে কী একটা রিপোর্ট নিয়ে কথা বলছিল স্যরের সঙ্গে।

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই স্যর হাত তুলে রাজুদাকে চুপ করতে বলল, "হাই রয়? তো কেমন হল তোমার আজকের প্রেজেন্টেশন?"

আমি বললাম, "স্যর আই হ্যাভ ট্রায়েড।"

"আমি তোমায় আগেও দেখেছি। কিন্তু এবার ইউ সিমড আনঅরগানাইজড টু মি। কথা বলতে-বলতেও তুমি একবার টাই ঠিক করছিলে, জামার বোতামে হাত দিচ্ছিলে, আরও কিছু করছিলে। কেন? কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ? তোমায় দেখেও আমার অসুস্থ মনে হচ্ছে।"

আমি ঘাবড়ে গেলাম, "কিছু না তো স্যর। আয়াম ফাইন।"

স্যর ভুরু কুঁচকে বললেন, "ডোন্ট লাই টু মি। তোমার কোনও প্রবলেম থাকলে আমায় বলো। তুমি একটা ভাইটাল কাজে যাচ্ছ। আমি সবসময় ইয়ং ব্লাডদের পছন্দ করি। তাদের পুশ করতে চাই সামনে। তাই রাজুর রেকমেন্ডেশন মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমিও তো আর লঙ্গর খুলে বসিনি। আমায় কাজ পেতে হবে। তাই আমায় বলো কী হয়েছে তোমার। এনি ফ্যামিলি প্রবলেম?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে রাজুদার দিকে তাকালাম।

রাজুদা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় স্যরকে বলব, "অ্যাকচুয়ালি স্যর, ওর কিছু লোনের দরকার। টু ল্যাকস। কিন্তু আমি বলেছি যে ওই প্রেজেন্টেশনের আগে কিছু সম্ভব নয়।"

"টু ল্যাকস?" স্যর আমার দিকে তাকাল, "তার জন্য ইউ লুক লাইক আ কোন্ডড ভ্যাগাবন্ড। সত্যি কি তাই? সবার টাকার দরকার, তা বলে তোমার মতো এমন তো কাউকে লাগে না! আমায় সত্যিটা বলো। ইনজিওর্ড প্লেয়ার পাঠিয়ে আমি ডুবতে চাই না।"

আমি ঠোঁট চাটলাম। আমাদের সিএমডি লোকটা একটু অন্য ধরনের। মানে অফিস প্রোটোকলের ধার ধারেন না খুব একটা। আমার ইন্টারভিউ-এর পর প্রথম মিটিঙে দেখেছিলাম খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

"কী হল? বলো। আমি অপেক্ষা করছি।"

আমি কিছু বলতে যাব কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একটা গন্ডগোলের মতো শুনলাম আমার পিছনে। দেখলাম রাজুদা থেকে সিএমডি সবাই আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে। আমিও ঘুরলাম।

এখান থেকে আমাদের গেস্টরুমটা দেখা যায়। যদিও তাতে ব্লাইন্ডস দেওয়া থাকে। কিন্তু দেখলাম সে ঘর থেকে একটু জোরে কথা শোনা যাচ্ছে আর একজন পিওন সেখান থেকে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে হন্তদন্ত হয়ে।

"কী হয়েছে?" স্যর জিজ্ঞেস করলেন।

পিওন আমায় দেখিয়ে বলল, "স্যর ওর কাছে একজন মেয়ে এসে খুব ঝামেলা করছে। বলছে ওকে এক্ষুনি ডেকে দিতে। না ডেকে দিলে যাবেই না।"

"মেয়ে?" আমি থতমত খেলাম, "কী নাম?"

"শৈ... শৈ..." পিওনটি ঠিক মতো বলতে পারল না।

কিন্তু আমার হাত পা জমে গেল। শৈ আমার অফিসে এসে ঝামেলা করছে! সর্বনাশ। লোন তো দূরের কথা আমার এবার চাকরিটাও যাবে।

আমি বললাম, "স্যর, প্লিজ আমি কি একবার..."

স্যর মাথা নাড়লেন, "ও, নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড। তা বলে অফিসে? ইউ বেটার সলভ ইট রয়। সলভ ইট কুইক। আমি এখানে কোনও সিন চাই না। বুঝেছ?"

আমি কথা বলার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেললাম। এবার যে চাকরি যাবে সেটা নিশ্চিত। প্রথমে প্রেম, তারপর চাকরি। আর কী কী হবে আমার সঙ্গে?

আমি গেস্টরুমের দিকে যেতে-যেতে দেখলাম বরখা উঠে সিএমডি-র দিকে যাচ্ছে।

।৭।

রবিবারের মতো শনিবারও আমাদের অফিস বন্ধ থাকে। অন্যান্য সময় এই দিনটায় আমি আলসেমি করি। কিন্তু আজ আর তার উপায় নেই। কারণ সোমবারেই আমার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা। কাল রবিবার সন্ধেবেলা ক্লায়েন্টের একটা টেকনিকাল টিম এসে পড়ছে শহরে। ফাইভ স্টারে তাদের জন্য ঘরও বুক হয়ে গেছে। অফিসেও সবার মুখে টেনশন আর রাজুদা তো আমায় ফোন করছে বারবার।

আমি বলেছিলাম রাজুদাকে, "তুমি ভাইটাল কাজে নিজেই বরাবর পিচ করো। এবার কেন এমন করছ? আমার ওপর তোমাদের তো ভরসাই নেই।"

রাজুদা বলেছিল, "ভরসা ছিল বলেই তোর নাম রেকমেন্ড করেছি। তুই আমাদের অফিসের বেস্ট ছেলে। আর আমাদেরও তো নতুন ছেলেদের সামনে আনতে হবে। যে অরগানাইজেশনে নতুনদের সুযোগ দেয় না তাদের গ্রোথ লিমিটেড হয়ে যায়। তাই তোকে কাজটা দেওয়া। আমরা মনেও করি যে তুই পারবি। কিন্তু লেটলি তুই যা শুরু করেছিস! তাই তো টেনশন হচ্ছে। সাধ করে কি আমি রাতের ঘুম ছেড়েছি?"

আজকেও রাজুদা চারবার ফোন করেছে। আমি কতটা তৈরি হচ্ছি তাই নিয়ে খুব টেনশন করছে লোকটা।

আমি চেষ্টা করছি খুব। সেদিন অফিসের সেই ঘটনাটার পর আমি নিজেকে আরও কিছুটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছি। খুব জোর করে মনটাকে বেঁধে কাজ করার চেষ্টা করছি। নিজেকে বারবার বোঝাচ্ছি যে সিএমডি স্যর অফিসে ওই সিন ক্রিয়েট হওয়ার পরও আমার ওপর ভরসা রেখেছেন, তাঁর ভরসার দাম আমায় দিতেই হবে। বোঝাচ্ছি, যে মেয়ে সবার সামনে অমন করে অপমান করতে পারে

আমায় তার জন্য আমি সব ত্যাগ করব? আমি কি ভুলে যাব সেদিন শৈ কী করেছিল আমার সঙ্গে।

সেদিন ওই গেস্টরুমে ঢোকার সময় আমার হাত পা ঘামছিল ভীষণ। কী যে হবে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ শৈ এল কেন আমার অফিসে?

আমি ওই ঘরে ঢোকামাত্র শৈ ছিটকে উঠেছিল চেয়ার থেকে, "এই যে, কী পেয়েছ কী তুমি?"

"কী হয়েছে শৈ?" আমি একটু আকুল হয়ে উঠেছিলাম। এতদিন পরে ওকে দেখলাম। ও আমার এত কাছে! আমার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

"কী হয়েছে? তুমি কী শুরু করেছ কী? তুহিনকে তুমি কী বলেছ? আর ঝিকিকে?"

"আ-আমি?" কী যে বলব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

"নয়তো কে আমি?" শৈ এগিয়ে এসেছিল আমার কাছে, "তুমি গাধা? বুঝতে পারো না যে আমাদের মধ্যে আর কিছু নেই। কিচ্ছু নেই। ইটস ওভার, ফাকিং ওভার। কেন আমায় কল করো? কেন বারবার মেসেজ করো?"

"এত সহজে ওভার?" আমি তাও চেষ্টা করেছিলাম।

"মানে? এটা কি অঙ্ক নাকি যে সহজ আর কঠিন বলছ? ক্যালকুলাস ছাড়া আর কিছু বোঝো তুমি? গবেট একটা। আমি ভুল করেছিলাম তোমার সঙ্গে রিলেশনে গিয়ে। আমি এখন জানি আমার কী চাই। আর সেটা তুমি নও। কত সাহস তোমার? আমায় বিচ বলেছ? হাউ ফাকিং ডেয়ার ইউ আর!"

আমি কিছু বলতে গিয়েও আর বলতে পারিনি। আমি বুঝতে পারছিলাম যে শৈ যেভাবে চিৎকার করছে তা অফিসের সবার কানেই ঢুকছে।

শৈ আরও এগিয়ে এসেছিল, তারপর আমার জামার কলার ধরে বলেছিল, "সবার সামনে এমন বেইজ্জত করব না যে রাস্তায় বেরতে পারবে না। কে বিচ তখন বোঝাব তোমায়। আমার পিছনে লাগা বের করে দেব। তুহিনের সঙ্গে আমি মোটেও প্রেম করছি না। বাজে কথা রটালে না একদম ভোঁতা করে দেব মুখ।"

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। কান্না পাচ্ছিল আমার। অপমানে মনে হচ্ছিল শরীরের সমস্ত রক্ত পা দিয়ে বেরিয়ে যাবে অফিসের মেঝেতে।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে শৈ হুমকির স্বরে বলেছিল, "আমার নামে মিথ্যে কথা রটাবে না বলে দিলাম। একদম ফালতু কথা রটাবে না।"

আজ সারাদিন নিজেকে ঘরের ভিতর আটকে রেখেছি আমি। স্নান আর খাওয়া ছাড়া আমি বেরই হইনি ঘর থেকে। প্রেজেন্টেশনের জন্য আমায় খুব ভাল করে তৈরি হতে হবে। সেদিন ওই ঘটনার পর সার বলেছিলেন, "আর কোনওদিন পারসোনাল প্রবলেম অফিসে টেনে আনবে না। এটা আমি ভুলে যাব এবারের মতো। কিন্তু মনে রেখো এবারের মতোই শুধু! ভাল করে প্রেজেন্টেশন দাও, কোম্পানি তোমায় দেখবে। আর না হলে

মাথাটা কেমন যেন ভোঁ হয়ে আছে। ভাল লাগছে না কিছু। যতই মন দেওয়ার চেষ্টা করি না কেন, ফাঁক পেলেই শৈয়ের কথাগুলো হুলের মতো ফুটছে শরীরে।

জেনো বরখা ইজ নেক্সট ইন দ্য লাইন।"

আমি জানি বরখা আছে। কিন্তু আমি না পারলে তবেই ওর সুযোগ আসবে। তাই আমায় পারতেই হবে। এই চান্স আমি মিস করব না কিছুতেই। তাই আমি আজ সারাদিন দাঁতে দাঁত চেপে সেই কলেজ জীবনের সেমেস্টারের আগের মতো নিজেকে তৈরি করছি।

সন্ধের একটু আগে ফাইলপত্তর সরিয়ে রেখে বিছানায় একটু টানটান হলাম। মাথাটা কেমন যেন ভোঁ হয়ে আছে। ভাল লাগছে না কিছু। যতই মন দেওয়ার চেষ্টা করি না কেন, ফাঁক পেলেই সেদিনের ওই শৈয়ের কথাগুলো হুলের মতো ফুটছে শরীরে। কষ্টের চেয়েও বেশি অপমান লাগছে। আমি মিথ্যে কথা বলেছি? মিথ্যে রটিয়েছি? আমি নিজের চোখে দেখেছি তুহিনের সঙ্গে ওকে, সেটা মিথ্যে! আমি ফালতু কথা বলি!

নানু ছাড়া এই কথাটা আমি আর কাউকে বলতে পারিনি। নানুর কাছে কথাটা বলতে-বলতে আমার চোখে জলও এসে গিয়েছিল। নানু অবশ্য কিছু বলেনি তেমন। আমার পিঠে হাত দিয়ে শুধু বলেছিল, "অমন করিস না। জানবি, সবার সময় আসে।"

আমার সময় আসবে না। ছোট থেকে সব কিছুতেই লড়াই করতে হয়েছে আমায়। তারপর জীবনে যখন একটু সেটল হলাম, সেখানেও বাধা। মাঝে-মাঝে মনে হয় কী হবে কাজকম্ম করে? মায়ের পর আর কে আছে আমার?

শুয়ে থাকতে-থাকতে আমার চোখটা লেগে এসেছিল একটু, তখনই কানের কাছে মোবাইলটা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

আমার মুখ কুঁচকে গেল বিরক্তিতে। এই রাজুদাটা না মাইরি! এমন করছে যেন আমি ফাঁকিবাজ বাচ্চা! যেন আমার কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই!

হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে দেখলাম। আরে নানু!

"হ্যাঁ, কী রে তুই?" আমি অবাক গলায় প্রশ্ন করলাম।

নানু উত্তেজিত গলায় বলল, "শৈ একটু আগে চুমু-কেবিনে ঢুকেছে। আমি শিওর এবার তুহিনও আসবে। তুই চট করে চলে আয়। আজ ভিতরে ঢুকে দু'টোকে হাতে-নাতে ধরবি, তারপর বলবি যে ফালতু কথা তুই রটাসনি। ও যেটা করছে সেটাই বলেছিস। চলে আয় হিরণ্য, লেট করিস না। এমন হাতে-নাতে ধরার সুযোগ আর পাবি না তুই।"

আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম খাট থেকে। আমার বাড়ি থেকে বড় রাস্তা জোরে হাঁটলে চার মিনিট। দৌড়ে গেলে দুই। আমি বাড়ির টি-শার্ট আর পাজামা পরেই বেরিয়ে গেলাম। মা একটু অবাক হল কিন্তু আমার তাড়া দেখে তেমন কিছু বলল না।

আমি অর্ধেক হেঁটে আর অর্ধেক দৌড়ে তিন মিনিটে নানুর কাছে পৌঁছলাম।

নানু চায়ের দোকানের বেঞ্চে উদগ্রীব হয়ে বসেছিল। আমায় দেখেই উত্তেজিতভাবে বলল, "এই একটু আগে আমি এসেছি এখানে, আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখলাম শৈ এদিক ওদিক কোনওমতে দেখে চুমু-কেবিনে ঢুকে গেল।"

"তোকে দেখতে পায়নি?"

নানু বলল, "না, আমি ওই আড়ালের দিকে ছিলাম তখন। আর ও এত তাড়াহুড়ো করছিল যে খেয়াল করেনি। আমার শালা দেখেই রাগ হয়ে গেল। তুই ফালতু কথা বলেছিস! এই চুমু-কেবিনে কী করতে এসেছে তবে? অল্প বয়সিরা চুমু-কেবিনে আসে কেন? চাউমিন

মোগলাই খেতে?"

আমার শরীরটা রাগে জ্বলছে। আমায় সবার সামনে অপমান? আজ হাতে-নাতে ধরব দু'টোকে। সবার সামনে ওকে ঝাড়বে তারপর গায়ের জ্বালা মিটবে আমার।

আমি নানুর পাশে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাঁচমিনিট, সাতমিনিট, ন'মিনিট। তুহিন কই? তারপর হঠাৎ আমার অন্য একটা সম্ভাবনা মাথায় এল।

আমি বললাম, "হ্যাঁরে নানু, তুহিন যদি আগে থেকেই ভিতরে এসে বসে থাকে, তবে?"

নানু আমার দিকে তাকিয়ে একবার ঠোঁটটা চাটল। তারপর চোখ গোলগোল করে বলল, "তাই তো, এটা তো মাথায় আসেনি!"

"তবে কী করি বলতো?"

নানু মাথা চুলকে বলল, "তুই ভিতরে গিয়ে দেখ একবার। হাতে-নাতে ধরতেই হবে ওকে। অফিসে গিয়ে অমন করেছে তোর সঙ্গে, এর একটা তো বিহিত করতে হবে, নাকি?"

আমি উঠে পড়লাম। একবার দেখতেই হবে আমায়। এভাবে সুযোগ নষ্ট করা যাবে না। আমার মন শান্ত না হলে কোনও কাজ করতে পারব না।

রাস্তা পার হয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম চুমু-কেবিনের সামনে। এক মুহূর্তের জন্য আমার বুকটা কাঁপল। এখানে কতদিন আমি এসেছি শৈয়ের সঙ্গে। পরদা-ঢাকা কিউবে বহু বহুবার আমি চুমু খেয়েছি শৈকে। আর শৈ আজ সেখানেই অন্য একজনের সঙ্গে... ওঃ, আমি আর ভাবতে পারছি না।

চোয়াল শক্ত করে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

কেবিনের ভিতরে বিশেষ লোকজন নেই। দূরে কাউন্টারে বসে ক্যাশিয়ার মানুষটি হাই তুলে আমার দিকে তাকাল তারপর আবার খবরের কাগজে মুখ গুঁজে ফেলল।

আমি এদিক ওদিক তাকালাম। দু'জন বসে আছে বাইরে। এর মধ্যে নেই শৈ। নভেম্বরের শেষেও আমার গরম লাগল খুব। কিউবগুলো দেখলাম এবার। পরপর ছ'টা। প্রথম পাঁচটার পরদা খোলা, ভিতরে কেউ নেই। কিন্তু দেওয়ালের ওই মাথায় কিউবটার পরদা টানা আছে। তবে কি ওটাতেই ওরা আছে?

মাথার ভিতর কী যে একটা পাক খেয়ে উঠল আমার নিজেই বুঝতে পারলাম না। সারাজীবনের ভীতু মানুষটাকে ছিঁড়ে যেন একটা দৈত্যের মতো কেউ বেরিয়ে এল। আমি ভুলে গেলাম এভাবে কারও প্রাইভেসিতে ঢোকা অভদ্রতা। অন্যায়ও।

প্রায় লাফিয়ে আমি ওই কেবিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর মনের সব জোর জড়ো করে পরদা সরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

"এই ধরেছি তো..." কথাটা মাঝপথে গিয়ে গোঁত্তা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। চোখও কপাল বেয়ে ব্রহ্মতালুতে ওঠার উপক্রম করল যেন।

দেখলাম, পরদার আড়ালে শৈ-এর ঠোঁটের ভিতরে নিজের ঠোঁট গুঁজে দিয়ে প্রাণপণে চুমু খাচ্ছে ঝিকি!

মুহূর্তের জন্য আমার পা কে যেন সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে দিল মেঝেতে। শৈ আর ঝিকি! এখানে!

শৈ প্রথম দেখল আমায়। দ্রুত নিজেকে ঝিকির থেকে আলাদা করে নিয়ে বলল, "তু-তুমি? এ-এখানে?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, "তোমরা!"

"প্লিজ, কাউকে বোলো না। উপায় ছিল না। উই লাভ ইচ আদার। প্লিজ।" শৈ এমন কাতর হয়ে কথা বলতে পারে!

আমি নিজেকে সামলে নিলাম। বুঝলাম আমার এখানে দাঁড়ানো আর ঠিক হবে না। আমি পিছন ঘুরে বেরিয়ে এলাম বাইরে।]পিছন-পিছন ওরাও বেরিয়ে এল।

শৈ বলল, "প্লিজ হিরণ্য, ঝিকিকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছি জীবনে কী চাই। সবাই জেনে গেলে আমাদের খুব খারাপ অবস্থা করবে। মানুষ কেমন ছোট মনের হয় জানোই তো। প্লিজ, ঝিকিকে ছাড়া আমি বাঁচব না। ও আমায়..."

আমি না দাঁড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। ওরা আসছে পিছন-পিছন। শৈ আরও যেন কীসব বলছে। অনুনয় করছে। ক্ষমাও চাইছে বোধহয়।

আমি শুনলাম ঝিকি বলছে, "হিরণ্য, আমি জানি তুই ভাল ছেলে। আমাদের কথাটা প্লিজ শোন।"

'ধুতি' না তবে? তবে আমি হিরণ্য? আচ্ছা! আমি না দাঁড়িয়ে তরতর করে নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। ওরা আর এল না। অসহায়ভাবে শুধু ওপর থেকে দেখল।

কলকাতায় অদ্ভুত একটা হাওয়া বয়, যাকে বলে সুবাতাস। এখানে কিছু না খেয়ে থাকলেও মিষ্টি হয়ে থাকে মুখ। সারাদিন সারারাত এখানে অসংখ্য প্রজাপতি ওড়ে। এখানে সব প্রেজেন্টেশনের পরে মুগ্ধ হয়ে যায় ক্লায়েন্টকুল। স্যারেরা টাকার থলি হাতে অভ্যর্থনা করে কর্মচারীকে। এখানে দিদিরা খুব ভালবাসে ভাইদের। মায়েরা কাছ-ছাড়াই করতে চায় না নিজের ছেলেদের!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমি এই নতুন একটা কলকাতায় হাঁটতে শুরু করলাম। আমার ভাল লাগছে খুব।
মনের ভিতরে ভোরবেলার মতো ঝরঝরে ভাব। বেশ বুঝতে পারছি ক্লাসের ফার্স্ট বয়টি আজও ফার্স্টই আছে।
কোনও ছেলের এখনও ক্ষমতা হয়নি যে তাকে টপকে চলে যায়।
তাকে হারায়।

অলঙ্করণ: দেবাশিস দেব